নীলকণ্ঠ

অজয়কুমার ভট্টাচার্য

অমৃতের সন্ধানে দেবতারা সমুদ্রমন্থন করছেন। মন্দার পর্বত তাঁদের মন্থনদণ্ড আর বাসুকি মন্থনরজ্জু। দেবতাদের অমর হতে হবে যাতে ভোগপর্বে কখনও ইতি না ঘটে। প্রথম প্রথম অতি উত্তম বস্তু সব বেরিয়ে আসতে লাগল, যেগুলি নিজেদের মধ্যে পদাধিকার অনুযায়ী ভাগ করে নিলেন তাঁরা। কিন্তু যা 'অগ্রে অমৃতোপমং, পরিণামে বিষমিব', বিষ যে তাকে অনুসরণ করবেই একথা সবাই বিস্মৃত হয়েছিলেন ভোগের আনন্দে। তাই সে-উত্থিত গরল যখন আকাশ-বাতাস ছেয়ে ফেলতে লাগল তখন সকলের কণ্ঠে 'রক্ষা করো, রক্ষা করো' ধ্বনি। এই বিশ্বের যিনি নাথ, সেই বিশ্বনাথ আর্তের প্রতি করুণায় এসে সে-গরল নিঃশেষে পান করে সকলকে রক্ষা করলেন। সে-বিষ তাঁর কণ্ঠে আবদ্ধ হয়ে নীল হয়ে রইল।

এটি পৌরাণিক কাহিনি হলেও এর ভাবের সত্যতা অপরিমেয়। ভোগবাদী মানুষের ধারণায় এ-জগৎ তারই ভোগের জন্য সৃষ্টি। তাই সে এবং তার ভোগ্যবস্তু ছাড়া ভোগের প্রতিবন্ধক প্রাণিকুলের কোনও প্রয়োজন সে স্বীকার করে না, এমনকী তাদের বেঁচে থাকার অধিকারও আছে বলে মনে করে না। অণুজীব থেকে বুদ্ধির সর্বোচ্চ বিকাশ মানুষ পর্যন্ত এই সৃষ্টি-শৃঙ্খলার পারস্পরিক সম্বন্ধযুক্ত এক-একটি বলয়, যার একটির বিচ্যুতি সমগ্র চক্রটির ছেদ ঘটিয়ে বিশৃঙ্খলা ঘটাতে সক্ষম—একথা আমরা ভুলে যাই। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন (৩।১৬),

''এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি॥''

কর্মচক্রের যে-উদ্দেশ্য নিরূপিত হয়ে আছে তার অনুবর্তন না করে শুধুমাত্র ভোগের উদ্দেশ্যে কর্মকারী ব্যক্তি ইন্দ্রিয়াসক্ত, পাপাচারী। তার মনুষ্যজন্ম বৃথা বলে শ্রীভগবান নিন্দা করছেন। অপরিমেয়, যথেচ্ছ ভোগে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে, পরিবেশ দূষণের পরিণাম কী হতে পারে তা আমরা ইদানীং দেখতে শুরু করেছি। আর সে-দূষণ শুধু প্রাকৃতিক পরিবেশেই নয়; আত্মিক, ব্যাবহারিক সর্বক্ষেত্রে ফুটে উঠেছে। অতএব আবার প্রয়োজন হয়েছে নীলকণ্ঠের। তবে এবারে যে-নীলকণ্ঠকে জগৎ পেয়েছে তাঁর প্রভাব সুদূরপ্রসারী। তাই সে-প্রভাবের চলন ধীর ও প্রকাশ দ্বিমুখী। প্রথম মুখটি হল এই সঞ্চিত গরলের ক্রিয়াকে প্রশমিত করা, এবং দ্বিতীয় মুখ—এক বিষহীন জীবনের প্রতি আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি।

বাঁধনহারা ভোগলিপ্সা গরলের জন্ম দেয় মানুষের মনে, আর তারই প্রকাশ ঘটে তার কাজে, ভাবনায়, সংস্কৃতিতে। তা সঞ্চারিত হয় তার ধর্মেও। ধর্মে কলুষ জন্মায় তাকে ভোগের উপযোগী করে তোলার চেষ্টায়, শাস্ত্রের পছন্দমতো ব্যাখ্যায়।

''যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতা পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ॥''
(গীতা ২।৪২)

জ্ঞানহীন ব্যক্তি কথার মাধুর্যে ভুলিয়ে, ভোগের সমর্থনে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্ত শুনিয়ে বলে যে এছাড়া আনন্দলাভের আর কোনও পথ নেই। এর প্রবক্তারা 'ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্', ভোগের আসক্তিতে যাঁদের বিবেকচেতনা মোহগ্রস্ত এবং তাঁদের ক্রিয়া 'ভোগৈশ্বর্যগতিং প্রতি'—ঐশ্বর্যভোগের উদ্দেশে (২।৪৩, ৪৪)। যুগের এইরকম এক অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের আগমন ঘটেছিল। এযুগে শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণের সম্মিলিত শক্তি আবির্ভূত হলেন যে-শরীরে, সে-শরীরে সম্মিলিত হল শ্রীরামের সত্যপ্রিয়তা, শ্রীকৃষ্ণের বিচক্ষণতা ও অনাসক্তি এবং তদুপরি যুগপ্রয়োজনে এক অদৃষ্টপূর্ব ত্যাগ। তাঁর সামনে যুগের সমস্যা তখন জটিলতম। কারণ এ কর্মকাণ্ডীদের বিভিন্ন কামনায় যজ্ঞ করা নয়, কর্মের উদ্দেশ্যই হারিয়ে গিয়েছে। ভোগস্পৃহা তো আছেই, কিন্তু তা পূরণের পথে বিশৃঙ্খলার চূড়ান্ত, সেইসঙ্গে ধর্মের নামে জটিল থেকে জটিলতর আচার-আচরণে ডুবে যাচ্ছে মানুষ। আচার-আচরণের বিভিন্নতা নিয়ে পারস্পরিক প্রবল দ্বন্দ্ব, কারণ বিশ্বাস নিজের আচরণটাই ধর্ম এবং অন্যেরটা ততটাই অধর্ম—নিজেরটি দামোদর শিলা, অন্যেরটি নুড়িমাত্র। যদি দেবতা হিসাবে তাকে মেনেও নেওয়া যায় তবু নিজের কুলীন শিলাটির তুলনায় সেটি শূদ্রাতিশূদ্র। এ শুধু সনাতন ধর্মে নয়, বিশ্বের মুখ্য সব ধর্মেরই এই অবস্থা। কোটি মতামতের পারস্পরিক বিবাদে জগৎ আঁধার। এ-আঁধার কাটাতে যে-আধার দরকার তার কোনও নির্দিষ্ট পদ্ধতি মেনে আসা সম্ভব ছিল না। তাই এবারের নীলকণ্ঠ পদ্ধতিগত সমস্ত বাহ্য অবলম্বন ত্যাগ করে শুধু 'মা' বলে ডাকা শুরু করলেন শক্তিরূপিণী জগৎস্রষ্টাকে। সন্তান যেমন মাকে না দেখতে পেলে আকুল হয়ে ডাকে, সেই আকুলতায়—''মা, তুই রামপ্রসাদকে দেখা দিয়েছিস, আমায় কেন তবে দেখা দিবি না? আমি ধন, জন, ভোগসুখ কিছুই চাই না, আমায় দেখা দে'' বলে মাটিতে মুখ ঘষে কান্না। ব্যাকুলতার এক অশ্রুতপূর্ব অবস্থা—''মা, এত যে তোকে ডাকছি; তার কিছুই কি তুই শুনছিস না?'' হৃদয়ে অসহ্য যন্ত্রণা, হৃদয়টাকে নিয়ে কেউ যেন গামছা নিঙড়ানোর মতো নিঙড়ে দিচ্ছে। মা বিনে জীবন অর্থহীন, মনে হল—একে দাও শেষ করে। এই ভাবনায় মার ঘরে যে-খাঁড়া ছিল তাই নিতে ছুটতেই—''ঘর, দ্বার, মন্দির সব যেন কোথায় লুপ্ত হইল—কোথাও যেন আর কিছুই নাই! আর দেখিতেছি কি, এক অসীম অনন্ত চেতন জ্যোতিঃ-সমুদ্র!—যেদিকে যতদূর দেখি, চারিদিক হইতে তাহার উজ্জ্বল ঊর্মিমালা তর্জন -গর্জন করিয়া গ্রাস করিবার জন্য মহাবেগে অগ্রসর হইতেছে! দেখিতে দেখিতে উহারা আমার উপর নিপতিত হইল এবং আমাকে এককালে কোথায় তলাইয়া দিল! হাঁপাইয়া হাবুডুবু খাইয়া সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া গেলাম!''

এই দর্শনের পর মায়ের চিন্ময়ীমূর্তি অবিরাম দর্শনের জন্য এক অভূতপূর্ব ব্যাকুলতা তাঁর হৃদয়কে অধিকার করে বসল। মাটিতে পড়ে এমন ব্যাকুল কান্না কাঁদতেন যে চারপাশে লোক দাঁড়িয়ে যেত। ''চারিদিকে লোক দাঁড়াইয়া থাকিলেও তাহাদিগকে ছায়া বা ছবিতে আঁকা মূর্তির ন্যায় অবান্তর মনে হইত এবং তজ্জন্য মনে কিছুমাত্র লজ্জা বা সঙ্কোচের উদয় হইত না! ঐরূপ অসহ্য যন্ত্রণায় সময়ে সময়ে বাহ্যসংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িতাম এবং

ঐরূপ হইবার পরেই দেখিতাম, মার বরাভয়করা চিন্ময়ী মূর্তি!—দেখিতাম ঐ মূর্তি হাসিতেছে, কথা কহিতেছে, অশেষ প্রকারে সান্ত্বনা ও শিক্ষা দিতেছে।" ধর্মপথে জগতের সমস্ত আচার-আচরণের উদ্দেশ্যটি কী সেটি যেন শ্রীরামকৃষ্ণ জগতের সামনে তুলে ধরলেন। খোসাটি আছে ফলের শাঁসের জন্য, শাঁসের আস্বাদ পেলে আর খোসাটির রং, ঔজ্জ্বল্য ইত্যাদির কোনও মূল্য থাকে না। নিজেদের আচার-আচরণ আমাদের কাছে যতই মহনীয় মনে হোক, তার উদ্দেশ্য তাঁকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি করা—এই সরল সত্যটি আমাদের সামনে তুলে ধরতেই যেন শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যাকুলতা ও প্রথম দর্শন।

জগতের প্রতিটি ধর্মপথেই তখন আবর্জনার স্তূপ। অমৃতের পথে বিষগাছের ছড়াছড়ি। তাই এবার জগতের মায়ের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণের আবদার—তোমাকে পাওয়ার যত পথ আছে, সব পথে চলে তোমার কাছে পৌঁছব এইটি করে দাও। বিষে ভরা অগম্য পথগুলিতে চলে তাকে পুনরুদ্ধার করে ঈশ্বরবিশ্বাসীদের হাতে তুলে দিতে হবে। তাঁর মধ্যে তখন দুটি সত্তা; একটি হল—জগতের মা নিজে তাঁর হৃদয়ে অবস্থান করছেন, অপরটি—সেই মায়েরই ভক্ত নানা আবেদন-নিবেদন করছেন। মা তাঁর ভক্তের কাছে প্রতিটি সাধনপথের সমস্ত প্রয়োজন অর্থাৎ সে-পথের সাধক, গুরু, শাস্ত্র ও সে-পথে চলার প্রয়োজনীয় পরিবেশ হাজির করতে থাকেন। সনাতন ধর্মের মুখ্য সমস্ত পথ এবং জগতের অন্য দুই মুখ্য ধর্মের সাধনে সিদ্ধির পর সিদ্ধান্ত পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল—'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি।' সেই অনন্ত সত্তাই সর্ব ভাবের পরিণতি—এই দার্শনিক সিদ্ধান্তটি এতকাল অনুমানাত্মক ছিল বলেই মনে হয়, কারণ এর আগে কেউ এভাবে প্রতিটি পথ পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন বলে জানা যায় না। এবারে তার দরকার হয়েছিল সমগ্র ধর্মজগতের গ্লানি বিমুক্ত করতে।

পথপ্রদর্শক বা গুরু হিসাবেও তখন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যাঁরা এসেছেন তাঁরাও তাঁদের প্রদর্শিত পথে শিষ্যের অক্লেশ সিদ্ধি দেখে পূর্ণ বা পূর্ণতর হয়ে ফিরে গেছেন। এ এক অপূর্ব শিষ্য যাঁর সঙ্গগুণে তাঁদের নিজের পথের শেষ বাধাটুকু দূর হয়ে গেছে। রামায়েৎ সাধু তাঁর রামলালাকে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে রেখে 'ওহি রাম ঘট ঘট মে লেটা'-র সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছেন। ভৈরবী ব্রাহ্মণী দীর্ঘদিন দক্ষিণেশ্বরে বাস করেছেন। ঠাকুরকে শক্তিতন্ত্রের সাধন করিয়ে তাঁকে দিব্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে দেখে উত্তম শিষ্যের অহংকারে অহংকৃত হয়ে পড়েছিলেন। কামারপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে গিয়ে এমন কিছু ঘটেছিল যে সে-অহংকার থেকে আধ্যাত্মিক পতনের ভীতি তাঁকে গ্রাস করে ফেলে ও তিনি নিজের দুর্বলতা বুঝতে পেরে পূর্ণতর হওয়ার সাধনায় চিরকালের জন্য কাশী চলে যান। তাঁর দুই শিষ্য চন্দ্র ও গিরিজা তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধাইয়ের অধিকারী ছিলেন। তাঁদের কল্যাণের জন্য তাঁদের দুজনেরই সিদ্ধাই শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের দেহে টেনে নিয়ে তাঁদের ঈশ্বরের পথে এগিয়ে দেন। বলেন, ''মা এর ভেতরে তাদের কল্যাণের জন্য তাদের সিদ্ধাই বা শক্তি আকর্ষণ করে নিলেন। আর ওইরূপ হওয়ার পর তাদের মন আবার ওইসব ছেড়ে ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে গেল।" পরবর্তী কালে চন্দ্রের কিছু খবর আমরা লীলাপ্রসঙ্গে—'গুরুভাবে নিজ গুরুগণের সঙ্গে সম্বন্ধ'-এর পাদটীকাতে পাই। স্বামীজী দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্যে যাওয়ার পর বেলুড় মঠে এক ব্যক্তি এসে চন্দ্র বলে নিজের পরিচয় দেন ও স্বামী ব্রহ্মানন্দজী তাঁকে সমাদরে মঠে থাকতে দেন। তিনি ঠাকুরঘরে ঠাকুরের ছবি দেখে তাঁকে দাদা বলে সম্বোধন করেন ও অজস্র চোখের জল ফেলতে থাকেন। তাঁর মধ্যে তখন খুব ত্যাগের ভাব। পরনে ধুতি ও উড়ানি, হাতে ছাতা ও

ক্যাম্বিসের একটি ব্যাগ; যার মধ্যে আর একটি ধুতি, গামছা ও একটি ঘটিমাত্র ছিল। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের কথা খুব উৎসাহের সঙ্গে বলতেন। বলতেন যে, তাঁর ওপর করা শ্রীরামকৃষ্ণের সব ভবিষ্যদ্‌বাণীই ফলে গেছে, শুধু মৃত্যুকালে তাঁর দেখা পাওয়াটি বাকি। মাসখানেক মঠে কাটিয়ে তিনি চলে যান, আর ফিরে আসেননি।

তোতাপুরীজী—যিনি তিনদিনের বেশি কোথাও থাকতেন না—তাঁর দীর্ঘকাল দক্ষিণেশ্বরে দিন যাপন, অসুস্থতা ও গঙ্গায় দেহত্যাগের প্রচেষ্টার কথা বহুপঠিত। যে-মায়াকে চিরকাল অস্বীকার করে এসেছেন, তাঁর কৃপা বিনে যে অদ্বৈতের কপাট তাঁর কাছে উন্মোচিত হয়নি, সেই জ্ঞানের অপূর্ণতাটুকু পূর্ণ হতে তাঁর বাকি ছিল। গঙ্গায় আত্মহননের বিফল প্রয়াসে বুঝতে পারলেন, ''শরীরের ভিতর যতক্ষণ, ততক্ষণ তিনি না ইচ্ছা করিলে তাঁহার প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে কাহারও সাধ্য নাই—মরিবারও কাহারও সামর্থ নাই! আবার শরীর-মন-বুদ্ধির পারেও সেই মা—তুরীয়া, নির্গুণা মা!'' সেই রাত পোহালে সকালে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর শরীরের খবর নিতে এসে দেখেন তিনি উজ্জ্বল, উৎফুল্ল মুখে বসে আছেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখে বলে উঠলেন, ''রোগই আমার বন্ধুর কাজ করিয়াছে, কাল জগদম্বার দর্শন পাইয়াছি এবং তাঁহার কৃপায় রোগমুক্তও হইয়াছি। এতদিন আমি কি অজ্ঞই ছিলাম!''

''অনন্তর প্রভাতী সুরে নহবত-ধ্বনি হইতেছে শুনিয়া শিবরামের ন্যায় গুরুশিষ্য-সম্বন্ধে আবদ্ধ উভয় মহাপুরুষ উঠিয়া জগদম্বার মন্দিরে দর্শনার্থ যাইলেন এবং শ্রীমূর্তির সম্মুখে প্রণত হইলেন। উভয়েই প্রাণে প্রাণে বুঝিলেন, মা তোতাকে এইবার এখান হইতে যাইতে প্রসন্নমনে অনুমতি দিয়াছেন।''

গৌরী পণ্ডিত যখন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আসেন তখন তাঁর শরীরে সিদ্ধাইয়ের ঐশ্বর্য। তর্কযুদ্ধে তিনি অপরাজেয়। 'হা রে রে রে নিরালম্বো লম্বোদর-জননী কং যামি শরণম্' বলে এক বিকট হুংকারে প্রতিপক্ষের সমস্ত তর্কশক্তি হরণ করে নিতেন। প্রথমদিন দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে প্রবেশের সময় তাঁর ওই বিকট হুংকার শ্রীরামকৃষ্ণের ততোধিক উচ্চরবের হুংকারে নিষ্প্রভ হয়ে যায় ও তাঁর সিদ্ধাই লুপ্ত হয়ে যায়। শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্বের বিপক্ষে তর্ক করতে এসে তাঁর অবতারত্বে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায়। দক্ষিণেশ্বরে তাঁর সংসর্গে বাস করে পণ্ডিতের দিন দিন বৈরাগ্যের বৃদ্ধি হতে থাকে। শেষে একদিন তাঁর চরণে প্রণাম জানিয়ে বিদায় চান। ঠাকুর বলেন, ''সে কি গৌরী, সহসা বিদায় কেন?'' গৌরী করজোড়ে উত্তর দিলেন, ''আশীর্বাদ করুন যেন অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। ঈশ্বরবস্তু লাভ না করে আর সংসারে ফিরব না''

সবশেষে এলেন গিরিশ তাঁর ভৈরবসত্তায় জাগতিক পাপরাশিকে পেছনে নিয়ে। তিনি বিশ্বাসী, তাঁর নিজ অবস্থান সম্পর্কে সচেতন কিন্তু কোনও আধ্যাত্মিক সাধনের বন্ধনে ধরা দিতে নারাজ। তাঁর স্বাধীনতাস্পৃহা—যা তাঁকে স্বেচ্ছাচারী করে তুলেছিল—তা যথার্থ স্বাধীনতায় পরিণত করতে ঠাকুর অক্লেশে তাঁর বকলমা নিয়ে নিলেন। আর বকলমা দিতে পেরে ঠাকুরের অশেষ কৃপা-করুণার কথা মনে নিরন্তর উদিত হয়ে রইল। গীতার শ্লোক মূর্ত হয়ে উঠল তাঁর জীবনে—''অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্... ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি'' (৯।৩০-৩১)। অতি দুরাচারীও নিরন্তর ঈশ্বরমননে চিরশান্তির অধিকারী হয়ে ওঠে। উচ্ছৃঙ্খলতা চলে গিয়ে গিরিশ না চাইলেও ঈশ্বরচিন্তার শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ে হলেন অভূতপূর্ব বিশ্বাস ও শান্তির অধিকারী। তরুণ যোগীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী শ্রীরামকৃষ্ণের বালক ভক্তদের একজন। ঘটনাচক্রে বিবাহ করতে বাধ্য হওয়ায় লজ্জায় ঠাকুরের কাছে আসেন না। ঠাকুর

তাঁকে ডাকিয়ে এনে অনায়াসে বললেন, ''এখানকার কৃপা থাকলে একশটা বিয়ে করলেও কিছু হবে না।'' অলিখিত আরও কতশত জীবন যে এভাবে বাধামুক্ত, পাপমুক্ত হয়েছে তার হিসাব আমাদের কাছে নেই।

তবে এগুলিকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক উত্তরণের উদাহরণ বলে ধরা ভুল হবে। কারণ এগুলি যতটা না ব্যক্তিকেন্দ্রিক, ততোধিক ভাবকেন্দ্রিক। এঁরা সব এক-একটি ভাবের প্রতিভূ। জগতে যতরকম ভাবের মানুষ আছে, সেই সকল ভাবের মানুষের অন্তরেই শ্রীরামকৃষ্ণের অমলিন পথপ্রদর্শনের আলো পতিত হয়ে রইল। অপেক্ষা রইল কেবল তার প্রবেশের পথ করে দেওয়ার, হৃদয়ের জানালাটি উন্মুক্ত করার। জগতের সমস্ত মলিনতা, কালিমা, পাপরাশি নিবেদন করার এক নিশ্চিত ধারণকুণ্ড হয়ে রইলেন তিনি। সাগরমন্থনে শিবের দেহ চৈতন্যময়, তাই বিষ শুধুমাত্র কণ্ঠে নীলরঙের আভাস রেখে ক্ষান্ত হয়েছিল। কিন্তু মায়াধীশ যখন মায়াদেহ ধারণ করে আসেন তখন নরদেহের নিয়ম লঙ্ঘন করেন না। তাই এ-বিষ তাঁর কণ্ঠে যন্ত্রণাময় দুরারোগ্য ক্যানসার হয়ে তিল তিল করে দেহকে বিনাশের পথে ঠেলে দিল। তিনি জানতেন যে জগতের এ-বিপুল বিষ একদেহে নিষ্ক্রিয় করা সম্ভব নয়, তাই তাঁর শক্তি সারদাকে ভার দিলেন অজ্ঞানের অন্ধকারে পোকার মতো কিলবিল করা মানুষগুলিকে দেখতে। কিন্তু তার আগে দেবীর বোধন ঘটিয়ে নিলেন। অবতার সাধন করেন মানবকল্যাণে, সমগ্র সাধারণ মানুষের হয়ে, নইলে ঈশ্বরাবতারের সাধনপর্বের কোনও ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। ফলহারিণী দেবী সাধকের শুভ-অশুভ সব কর্মের ফল হরণ করে তাকে মুক্তি দেন। সেই বিশেষ দেবীপূজার দিনে, শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমাকে ষোড়শীরূপে পূজা করে নিজের সাধনলব্ধ সমস্ত কর্মের ফল তাঁর শ্রীচরণে অর্পণ করলেন। সে-ফল গ্রহণ করলেনও তিনিই, এক নতুন দেহে, নতুন রূপে। ব্রহ্ম ও শক্তির অভেদতত্ত্ব মান্যতা পেল তাঁর শক্তির মধ্যে তত্ত্বরূপে তাঁর উপস্থিতিতে। সেই মহাশক্তি এক মহাবাৎসল্যের আধার হয়ে সমগ্র জগতকে অক্লেশে সন্তানরূপে গ্রহণ করলেন। জগজ্জননী এক সরল উক্তিতে তাঁর কাজের ব্যাখ্যায় বললেন—আমার ছেলেরা ধুলোকাদা মাখলে আমাকেই তো সেই ধুলো ঝেড়ে কোলে তুলে নিতে হবে। সে-উদ্দিষ্ট কর্ম সাক্ষাৎভাবে সাধিত হল প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল ধরে। সে-ভার গ্রহণ করে অন্তরালবর্তিনী শ্রীমা সামনে এলেন সারা বুলের হাত ধরে ঘোমটাখোলা ছবি হয়ে। এ-ছবিতে মাতৃমূর্তির লালিত্য, রূপ ক্রমশ নিষ্প্রভ হতে সময় নিল না ঠাকুরের দেওয়া ভার বহনের কারণে। মায়ের কাছে অবারিত দ্বার, কারণ তীব্র তারণশক্তি বাৎসল্যের আধারে মোড়া। তাঁর কাছে 'পিঁপড়ের সার'। প্রেমানন্দজী বললেন, ''যে বিষ আমরা হজম করতে পারছি না, তা চালান করে দিচ্ছি মায়ের কাছে আর সব হজম হয়ে যাচ্ছে।'' কিন্তু সে-হজম তাঁর মায়াশরীরে প্রবল প্রতিক্রিয়া রেখে যেতে লাগল। শেষ অসুখ ব্ল্যাক ফিভার বা কালাজ্বরে মায়ের সর্বাঙ্গ অঙ্গারের মত কালো হয়ে গিয়েছিল। ভগবান যিশু জগতের পাপ গ্রহণ করে এক যন্ত্রণাময় মৃত্যুবরণ করেছিলেন, আর সশক্তিক শ্রীরামকৃষ্ণ তিল তিল যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে শরীরপাত করে গড়ে দিয়ে গেলেন আধ্যাত্মিক জগতের দিগ্‌দর্শী এক আলোকস্তম্ভ।

কিন্তু নীলরং কি শুধুই বিষের বা বিষক্রিয়ার? ঘন নীল আকাশে অনন্তের আহ্বান, নীল সমুদ্রে অসীমের দ্যোতনা। তাই নীলাম্বর পরিহিত রাধা-অঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণের নীল অঙ্গে মিশে অনন্ত মিলনের ডাক দিচ্ছে ভক্তপ্রাণে। অতএব যদি কারও কণ্ঠ থেকে বেরোয় সেই অনন্তের ধ্বনি, মুখে লেগে থাকে অনন্তের ভাষা, গানে অনন্ত-অভিমুখী সুরের মাধুর্য, তিনিও একরূপে নীলকণ্ঠ বই কী!

অবতার পুরুষ তো শুধু মানুষের পাপ গ্রহণ করেই ক্ষান্ত হন না, তাকে অনন্তাভিমুখী করে তোলেন, আর সেটাই তাঁর আসল কাজ। আর তাই কুঠিবাড়ির ছাদ থেকে দেওয়া সেই অনন্ত পথের আহ্বান পৌঁছে গেল উৎসুক প্রাণে প্রাণে। এলেন তাপদগ্ধ সংসারীরা ত্রিতাপ মুক্তির আশায়। এলেন ধর্মপথের পথিকরা একে একে—দয়ানন্দ, পদ্মলোচন, বৈষ্ণবচরণ, কেশবচন্দ্র সেন। এঁরা সবাই আন্তরিক কিন্তু দিশাহীন। কেশব তখন ঈশ্বর অনুরাগী, ভক্তিতে ও বাক্‌শক্তিতে ইয়াং বেঙ্গলের নেতৃস্থানীয়। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে তাঁর আত্মসমর্পণ তরুণদের এনে হাজির করল ঠাকুরের কাছে। শুরু হল ঈশ্বরভাবের এক অদ্ভুত কথার স্রোত। কেশব সেনের বাগ্মিতা যা তরুণদের মনোহরণ করেছিল তা ম্লান হয়ে গেল ঠাকুরের সরল বাচনভঙ্গি, উপমা ও গল্পে। এলেন জগৎ-আলো-করা জ্ঞানসূর্য থেকে ঘর-আলো-করা প্রদীপের দল। নরেন্দ্র এলেন অনন্তভাবময় শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবকে জগতময় ছড়িয়ে দিতে, আর মহেন্দ্র এলেন বৈচিত্র্যময় সে ভাবগুলিকে দু-মলাটের মধ্যে গ্রথিত করে ভাবীকালের অনুরাগীদের সামনে এক চিত্রময় বাণী তুলে ধরতে। গণ্ডিভাঙা সেই ভাবপ্রবাহ ছড়িয়ে পড়তে লাগল সারা বিশ্বে। তার শুরুটাও অবশ্য তিনি নিজেই করে গিয়েছিলে। একদিন ভাবভঙ্গের পর শ্রীমাকে বললেন যে এক জায়গায় গেছিলেন যেখানের মানুষ সাদা সাদা। সেই সাদা মানুষদের একজন মিসেস হুইলার এক বিশেষ সঙ্কটময় মুহূর্তে দেখলেন এক ভারতীয় যোগী অসীম করুণাময় দৃষ্টি দিয়ে তাঁকে কিছু বলতে চাইছেন। তারপর তাঁর সন্ধানে তিনি আমেরিকার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত খুঁজে বেড়িয়েছেন, যার পরিণতিতে বহু বছর পরে স্বামী সারদানন্দজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল ও তাঁর কাছে রাখা শ্রীরামকৃষ্ণের ছবিতে তাঁর ইষ্টের রূপ দর্শন করলেন। এরকম যে কত ঘটনা সামনে এসেছে তার ইয়ত্তা নেই। এগুলিও ব্যক্তিকেন্দ্রিক উত্তরণ নয়, বরং সেই সেই ভাবের ভাবুকদের জীবনে তাঁর অনুপ্রবেশ। সর্বভাব সমন্বয়ের তিনটি সূত্র পেল জগৎ—১। মনুষ্যজন্মের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ ২। লাভের উপায় তাঁকে পাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। ৩। যেকোনও ভাব, যেকোনও ধর্ম, যেকোনও আচার-আচরণই তাঁকে পাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট যদি ব্যাকুলতা থাকে। গীতার ব্যাখ্যা বললেন, গীতা দশবার উচ্চারণ করলে যা হয় অর্থাৎ তা 'ত্যাগী ত্যাগী' শোনায়। 'হে জীব, সমস্ত কিছু ত্যাগ করে ঈশ্বরের শরণ নাও।' গীতাতে ঠিক এই কথাই বলা আছে—'অনিত্যমসুখম্ লোকমিমম্ প্রাপ্য ভজস্ব মাম্।' ভগবান বলছেন, 'হে জীব, অনিত্য অসুখকর লোকে যখন এসে পড়েছ তখন একমাত্র আমারই ভজনা করো।' বিভিন্ন ভাব, ধর্ম, আচার, আচরণের গহনে যে-উদ্দেশ্য অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল তা আবার জগতের সামনে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ভাবজগতে বিপ্লবের বীজ পোঁতা হল, যার অঙ্কুর বেরিয়েছে আজ। স্বামীজীর ভবিষ্যদ্‌বাণী—আগামী দেড় হাজার বছরে তা মহীরূহে পরিণত হবে।

কুঠিবাড়ি থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের সেই ডাক এক চিরন্তন আহ্বানের সূচনা করে গেছে। স্থূলজগতের সে-ডাক সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হয়ে ভাবজগতে এক নতুন তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হচ্ছে। 'ধ্বনিল আহ্বান মধুর গম্ভীর প্রভাত অম্বর মাঝে/ দিকে দিগন্তরে ভুবনমন্দিরে শান্তিসঙ্গীত বাজে।' নীলকণ্ঠের কণ্ঠোত্থিত এ-আহ্বান অনন্ত নীলিমায় ছড়িয়ে আছে—শুধু আমাদের সে-ডাকে সাড়া দেওয়া অপেক্ষায়।